উপসংহার

উপসংহার

লোকশিক্ষার প্রাণপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবাদর্শকে শিরোধার্য করে স্বামী বিবেকানন্দ জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে অপরের কল্যাণভাবনায় নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। কল্পতরু শ্রীরামকৃষ্ণের 'যত মত তত পথ' ও 'শিবজ্ঞানে জীব সেবা'কে পাথেয় করে স্বামীজী আমাদের সর্বধর্ম সমন্বয়ের বাণী শুনিয়েছেন। শিকাগো ধর্মমহাসভার বক্তৃতাদানে তাঁর সেই ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে। স্বামীজী ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রণামমন্ত্র উচ্চারণ করেছেন—

"স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে।
অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ।।"[১]

স্বামীজীর সৃষ্ট এই প্রণামমন্ত্রের মধ্যেই ফুটে উঠেছে সর্বধর্ম সমন্বের বার্তা। স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ তাঁর 'বিবেকানন্দের বীজমন্ত্র : ধর্মান্ধতা নয়, জীবনে ধর্মের মর্মসাধন' শীর্ষক আলোচনায় বলেছেন—

> "নতুন এক পৃথিবীর বীজমন্ত্র স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের দিয়েছেন। নতুন এক পৃথিবী, নতুন এক সমাজ, নতুন এক সভ্যতা গড়তে হবে। সেখানে সম্প্রদায় থাকবে, কিন্তু থাকবে না সাম্প্রদায়িকতা। ধর্ম থাকবে, থাকবে না ধর্মান্ধতা। থাকবে প্রত্যেকের জীবনে ধর্মের মর্মসাধনের ব্যাকুলতা।"[২]

স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর গুরুভ্রাতারা 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' এবং 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' বিষয়ে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ ছিলেন। একজন কপর্দকশূন্য সন্ন্যাসী হয়েও স্বামীজী বিশ্ববন্দিত। তাঁর জীবন ও কর্ম পর্যালোচনা করে আমরা তাঁকে নির্দিষ্ট কোনও পরিচয়ের গণ্ডীতে সীমায়িত করতে পারি না। তিনি একাধারে ছিলেন সমাজসংস্কারক, স্বদেশপ্রেমিক, সত্যের প্রচারক,

অর্থনীতির রূপকার, জাতীয় ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক, দার্শনিক, সাহিত্যিক প্রভৃতি। উনিশ শতকে মানুষের জীবনে ও সাহিত্যে নবজাগরণের প্রভাব দেখা যায়। মধুসূদন দত্ত, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখের পাশাপাশি সাহিত্যক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দের স্বতন্ত্র আসন চিহ্নিত করা যায়। বিশেষ করে চলিত গদ্যের বিবর্তন, কলকাতার কথ্যভাষাকে সাহিত্যে প্রয়োগ, গদ্যে বীররসের ব্যবহার প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব। স্বামীজীর রচনার পরিমাণ স্বল্প হলেও সেগুলিতে গুণগত উৎকর্ষতা লক্ষ্য করা যায়।

উপনিষদের বাণী 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত'কে জীবনের মূলমন্ত্র করে তিনি এগিয়ে গিয়েছেন। সেইসঙ্গে গুরুভ্রাতাদেরও ঐ মন্ত্রে দীক্ষিত হতে বলেছেন। তিনি বনের বেদান্তকে ঘরে এনেছেন এবং কর্মে 'অভীঃ' মন্ত্রের প্রয়োগ করেছেন। অদ্বৈতবাদকেই তাঁর চিন্তাভাবনার মূল ভিত্তি করে তুলেছেন। স্বামীজী অনুধাবন করেছিলেন ভারতবর্ষের প্রকৃত সম্পদ আধ্যাত্মিকতা। স্বামীজী ছিলেন অফুরন্ত প্রাণশক্তির অধিকারী। তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত কার্যকলাপ ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের দ্বারা জীবনীশক্তি যেমন সঞ্চার করেছেন তেমনি নেতৃত্ব দিয়ে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন গড়ে তুলেছেন। নেতার সব গুণই তাঁর মধ্যে ছিল। সাহিত্যিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (দাদামশাই) স্বামীজী সম্বন্ধে জানিয়েছেন—

> "সমবয়সী হলেও এরূপ ছেলে পূর্বে দেখিনি— যেমন নির্ভীক, কথাবার্তাতেও তেমনি বহুদর্শী জ্ঞানীর মতো এ ছেলে কারও মুখ চেয়ে কথা কবার নয়, Leader বা নেতা হবার জন্যেই জন্মেছে— কোন মহাপুরুষের ধার ধারে না বা ধারবে না। একথা বা এ ধারণা সেই প্রথমদিনেই কে যেন আমাকে

দিয়েছিল। দেখলুম ঠাকুরও এঁকে চান। এ ছেলে Commander-in-chief হবার ছেলে— সোলজার নয়।"[৩]

ভারতের পুনর্গঠনেও স্বামী বিবেকানন্দ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। বিপ্লবীদের কাছে তাঁর বাণী ও কর্ম ছিল অনুসরণযোগ্য। স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ না করলেও স্বামীজীর ভাবধারা অন্যান্যদের উৎসাহ যোগায়। শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও নিজের লক্ষ্যে তিনি ছিলেন স্থির। স্বামীজী ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের ২৭শে জানুয়ারি ক্যালিফর্নিয়ায় প্যাসাডেনা সেক্সপিয়ার ক্লাবে প্রদত্ত 'আমার জীবন ও ব্রত' শীর্ষক বক্তৃতায় প্রতিকূলতার কথা জানাতে গিয়ে বলেছেন—

"একবার ভাবিয়া দেখুন, বারটি বালক মানুষের কাছে বড় বড় আদর্শের কথা বলিতেছে, সেই আদর্শ জীবনে পরিণত করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প। সকলেই হাসিত। হাসি হইতে ক্রমে গুরুতর বিষয়ে পরিণতি ঘটিত। রীতিমত অত্যাচার আরম্ভ হইল। ঠাট্টা-বিদ্রূপ যতই প্রবল হইয়া উঠিল, আমরাও তত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলাম।"[৪]

১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দের ২২শে জানুয়ারি থেকে ২৪শে জানুয়ারি পর্যন্ত স্বামীজীর সঙ্গে গুরুভ্রাতা ও শ্রীরামকৃষ্ণভক্তমণ্ডলীর অনেকেরই বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথোপকথন হয়, তা তুলে ধরা হয়েছে সুরেন্দ্রনাথ সেনের লেখা 'তিনদিনের স্মৃতিলিপি' অংশে। কথোপকথন সূত্রে স্বামীজী বারবার আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলতে উৎসাহ দিয়ে বলেছেন—

"চাই শ্রদ্ধা, নিজেদের ওপর বিশ্বাস চাই। Strength is Life, Weakness is death (সবলতাই জীবন, দুর্বলতাই মৃত্যু)।"[৫]

আবার শিক্ষা সম্বন্ধে বলেছেন—

"খালি বই-পড়া শিক্ষা হলে হবে না। যাতে Character form (চরিত্র তৈরি) হয়, মনের শক্তি বাড়ে, বুদ্ধির বিকাশ হয়, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে পারে, এই রকম শিক্ষা চাই।"[৬]

স্বামীজী বারবার নারীশিক্ষার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে বলেছেন। তাঁর 'ভারতীয় নারী—তাহাদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ' বিষয়ক একটি আলোচনা ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। স্বামীজী নারীশিক্ষা সম্বন্ধে বলেছেন—

"নারীদিগের সম্বন্ধে আমাদের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার শুধু তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া পর্যন্ত; নারীগণকে এমন যোগ্যতা অর্জন করাইতে হইবে, যাহাতে তাহারা নিজেদের সমস্যা নিজেদের ভাবে মীমাংসা করিয়া লইতে পারে। তাহাদের হইয়া অপর কেহ এ কার্য করিতে পারে না, করিবার চেষ্টা করাও উচিত নহে।"[৭]

অনাথ, দুঃখী, মূর্খ মানুষজনের প্রতি স্বামীজী ছিলেন সহানুভূতিসম্পন্ন। তাঁদের জাগরণের মধ্য দিয়েই ভারতবর্ষের চিত্রের পরিবর্তন ঘটতে পারে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। 'খালি পেটে ধর্ম হয় না' গুরু নির্দেশিত এই বাণী স্বামীজী মর্মে অনুধাবন করেন। 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থের স্বদেশ মন্ত্রে স্বামীজী উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। মূর্খ, দরিদ্র ভারতবাসীদের 'ভাই' বলে সম্বোধন করেছেন। এইসব মানুষজনদের আত্মনির্ভরশীল হওয়া একান্ত প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন।

পরিব্রাজক জীবনে স্বামীজী ভারতবর্ষের অতিসাধারণ দরিদ্র মানুষ থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রদেশের রাজন্যবর্গের সংস্পর্শে এসেছেন। প্রত্যক্ষ জীবন

অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন এইসমস্ত মানুষজনের সংস্পর্শে এসে নির্দ্বিধায় অতিথি হয়েছেন দরিদ্রের কুঠির থেকে শুরু করে মৌলবির গৃহে পর্যন্ত। এই সময়েই কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী সমগ্রভারতবর্ষের সভ্যতা-সংস্কৃতির সঙ্গে তিনি পরিচিত হন। মানব সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেন। স্বামী স্বাহানন্দ তাঁর 'বিবেকানন্দ-ভাবনা' গ্রন্থে স্বামীজীর সেবাকার্যের কথা জানাতে গিয়ে বলেছেন—

> "স্বামী বিবেকানন্দের অন্তর ছিল মাতৃসুলভ কোমল। দুঃখদুর্দশার দৃশ্য তাঁহাকে অভিভূত করিয়া তুলিত। যখন এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে বাংলার মাতৃভূমি জর্জরিত এবং তাঁহার গুরুভাইয়েরা ত্রাণ কার্যের জন্য যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিবেন কিনা সে বিষয়ে সন্দিহান, তিনি তখন বেলুড় মঠের সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া দিবার কথা সাগ্রহে চিন্তা করিয়াছিলেন। মানুষের কাছে শাশ্বত ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক পরম্পরার কথা পৌঁছাইয়া দিবার মহৎ উদ্দেশ্যে এই সম্পত্তি তখন তিনি সবেমাত্র খরিদ করিয়াছিলেন আর বৎসরের পর বৎসর তিনি এই মহান কর্ম সাধনের স্বপ্নও দেখিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্গত মানুষের সেবার আকুতি তখন তাঁহার অন্তরে এতই তীব্র আকার ধারণ করিয়াছিল যে সব কিছু তাঁহার কোমল হৃদয়ের কাছে তুচ্ছ হইয়া গিয়াছিল। সর্বপ্রকার প্রকৃত সেবাকার্যের চাবিকাঠিই হইল গভীর সহানুভূতি ও সমবেদনা।"[৮]

স্বামীজী ব্রাহ্মসমাজের সংস্পর্শে আসেন। তিনি এই সমাজের সাধারণ সদস্য ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশবচন্দ্র সেনের অত্যন্ত স্নেহধন্য নরেন্দ্রনাথ দত্ত যথাযথ মনের খোরাক না পেয়ে যখন অস্থির চিত্তে দিন কাটাচ্ছিলেন তখন রামচন্দ্র দত্ত অণুঘটকের কাজ করেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণের সঙ্গে স্বামীজীর মিলিত হবার অন্যতম মাধ্যম ছিলেন তিনি। শ্রীরামকৃষ্ণদেবকেও

পরীক্ষা না করে স্বামীজী গ্রহণ করেননি। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ছিলেন স্বামীজীর জীবন কান্ডারিস্বরূপ।

স্বামীজীর জীবনের জন্ম থেকে মহাসমাধি পর্যন্ত প্রত্যেকটি ঘটনাই ছিল শিক্ষাপ্রদ। ছোটবেলা থেকেই তাঁর উদ্যম, সাহস, উপস্থিত বুদ্ধি, সত্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা প্রভৃতি দেখা যায়। পিতার মৃত্যুর পর সংসারের দায়িত্ব নিজের কাঁধে আসলে শত প্রতিকূলতার মধ্যেও নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের কথা তিনি ভাবতে পারেন নি। স্বামীজী নিজে মুখেই সেই সংগ্রামের কথা জানাতে গিয়ে বলেছেন—

> "তারপর আসিল দারুণ দুঃসময়—ব্যক্তিগতভাবে আমার পক্ষে এবং অন্যান্য ভ্রাতাদের পক্ষেও। কিন্তু আমার পক্ষে সে কি নিদারুণ দুর্ভাগ্য! একদিকে মা ও ভাইএরা। পিতার মৃত্যুতে আমরা তখন চরম দারিদ্র্যে উপনীত। বেশির ভাগ দিন না খাইয়া থাকিতে হইত। পরিবারে একমাত্র আমিই আশা ভরসা—সাহায্য করিবার উপযুক্ত ছিলাম। আমার সম্মুখে তখন দুইটি জগৎ। একদিকে মাতা ও ভ্রাতাদিগকে না খাইয়া মরিতে দেখিতে হইবে; অপরদিকে বিশ্বাস করিতাম যে, গুরুদেবের ভাবধারা ভারতের তথা জগতের পক্ষে কল্যাণকর, সুতরাং এই আদর্শ জগতে প্রচার করিয়া কার্যে পরিণত করিতেই হইবে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এই দ্বন্দ্ব চলিল। কখন কখনও পাঁচ ছয় দিন ধরিয়া অবিরত প্রার্থনা করিতাম। সে কি হৃদয় বেদনা! আমি তখন দারুণ যন্ত্রণা অনুভব করিতেছিলাম! তরুণ হৃদয়ের স্বাভাবিক স্নেহ আত্মীয়গণের দিকে টানিতেছে—অতি প্রিয়জনদের দুরবস্থা সহ্য করিতে পারিতেছি না। অপর পক্ষে সহানুভূতি জানাইবার একটি লোকও নাই। বালকের কল্পনার প্রতি কে সহানুভূতি দেখাইবে? যে কল্পনার জন্য অপরকে এত কষ্ট পাইতে

হয়, সেই কল্পনার প্রতি কাহারই বা সহানুভূতি জাগিতে পারে? একজন ছাড়া কেহই সহানুভূতি জানাইল না।"[৯]

স্বামীজী চরম প্রতিকূলতার মধ্যেও মা কালীর কাছে প্রার্থনা করেন জ্ঞান, ভক্তি, বিবেক ও বৈরাগ্যের। তিনি আজীবন মায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন

স্বামীজীর বক্তৃতাগুলির মূল্যও অপরিসীম। আমেরিকা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর বিভিন্ন স্থানে স্বামীজী যে জ্বালাময়ী বক্তৃতাগুলি দিয়েছেন তা থেকে জীবনের রসদ আমরা খুঁজে পাই। উল্লেখযোগ্য বক্তৃতাগুলির কয়েকটি হ'ল— 'কলম্বোয় স্বামীজীর বক্তৃতা', 'জাফনায় বক্তৃতা—বেদান্ত', 'কুম্ভকোণম্ বক্তৃতা', 'মাদ্রাজ অভিনন্দনের উত্তর', 'আমার সমরনীতি', 'কলিকাতা অভিনন্দনের উত্তর' ইত্যাদি। 'জাফনায় বক্তৃতা—বেদান্ত'-এ স্বামীজী যেন আমাদের প্রত্যেকের ভেতর যে অনন্ত শক্তি রয়েছে তা খুঁজে বের করে বললেন—

"তুমি যাহা চিন্তা করিবে, তাহাই হইয়া যাইবে। যদি তুমি নিজেকে দুর্বল ভাব, তবে দুর্বল হইবে; তেজস্বী ভাবিলে তেজস্বী হইবে। যদি তুমি নিজেকে অপবিত্র ভাব, তবে তুমি অপবিত্র; নিজেকে বিশুদ্ধ ভাবিলে বিশুদ্ধই হইবে। অদ্বৈতবাদ আমাদের নিজেকে দুর্বল ভাবিতে শিক্ষা দেয় না, পরন্তু নিজেদের তেজস্বী সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ ভাবিতে উপদেশ দেয়।"[১০]

আবার 'মনমাদুরা অভিনন্দের উত্তর'-এ স্বামীজী অস্পৃশ্যতা ও ছুঁৎমার্গকে ত্যাগ করতে বলেছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর উক্তি—

"আমরা এখন বৈদান্তিকও নই, পৌরাণিকও নই, তান্ত্রিকও নই; আমরা এখন কেবল 'ছুঁৎমার্গী', আমাদের ধর্ম এখন রান্নাঘরে, ভাতের হাঁড়ি আমাদের ঈশ্বর, আর ধর্মমত—'আমায় ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না, আমি মহাপবিত্র।' যদি আমাদের

দেশে আর এক শতাব্দী ধরিয়া এইভাব চলে, তবে আমাদের প্রত্যেককেই পাগলা-গারদে যাইতে হইবে!”[১১]

স্বামীজী মাদ্রাজের ভিক্টোরিয়া হলে প্রদত্ত ‘আমার সমরনীতি’ শীর্ষক বক্তৃতায় স্পষ্টতই জানিয়েছেন ধর্মপ্রচারের পাশাপাশি প্রয়োজন জ্ঞানের বিস্তার। তাই তাঁর বক্তব্য—

“হে বন্ধুগণ, এইজন্য আমার সঙ্কল্প এই যে, ভারতে আমি কতকগুলি শিক্ষালয় স্থাপন করিব—তাহাতে আমাদের যুবকগণ ভারতে ও ভারত-বহির্ভূত দেশে আমাদের শাস্ত্র-নিহিত সত্যসমূহ প্রচার করিবার কাজে শিক্ষালাভ করিবে। মানুষ চাই, মানুষ চাই; আর সব হইয়া যাইবে। বীর্যবান, সম্পূর্ণ অকপট, তেজস্বী, বিশ্বাসী যুবক আবশ্যক। এইরূপ একশত যুবক হইলে সমগ্র জগতের ভাবস্রোত ফিরাইয়া দেওয়া যায়।”[১২]

১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ২৬ ফেব্রুয়ারি শোভাবাজার রাজবাড়িতে কলকাতাবাসীগণের পক্ষ থেকে স্বামীজীকে একটি অভিনন্দনপত্র দেওয়া হয়। সেই সভার সভাপতি রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের সংক্ষিপ্ত ভাষণের পর অভিনন্দনের উত্তর প্রসঙ্গে স্বামীজী তাঁর বক্তৃতায় বিভিন্ন বিষয়ের অবতারণা করেন। সেইসঙ্গে তিনি বলেন—

“লোকে বলিয়া থাকে, বাঙালী জাতির কল্পনাশক্তি অতি প্রখর, আমি উহা বিশ্বাস করি। আমাদিগকে লোক কল্পনাপ্রিয় ভাবুক জাতি বলিয়া উপহাস করিয়া থাকে। কিন্তু বন্ধুগণ! আমি তোমাদিগকে বলিতেছি ইহা উপহাসের বিষয় নয়, কারণ প্রবল উচ্ছ্বাসেই হৃদয়ে তত্ত্বালোকের স্ফুরণ হয়। বুদ্ধিবৃত্তি—বিচারশক্তি খুব ভাল জিনিস, কিন্তু এগুলি বেশিদূর যাইতে পারে না। ভাবের মধ্য দিয়াই গভীরতম রহস্যসমূহ উদ্ঘাটিত হয়। অতএব বাঙালীর দ্বারা—

ভাবুক বাঙালীর দ্বারাই ঐ কার্য সাধিত হইবে। 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত'—উঠ, জাগো, যতদিন না অভীপ্সিত বস্তু লাভ করিতেছ, ততদিন ক্রমাগত সেই উদ্দেশ্যে চলিতে থাক, ক্ষান্ত হইও না।"[১৩]

স্বামীজীর সেই অভ্রান্ত বাণী আজও আমাদের চলার পথের পাথেয়।

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থে স্বামীজী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সভ্যতা ও সংস্কৃতির তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। এই গ্রন্থে চলিত ভাষায় ক্রিয়াপদ প্রয়োগের বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায়। এই রচনায় রীতিনীতি, পোশাক পরিচ্ছদ, খাদ্য, জাতি পরিচয় ইত্যাদি তুলে ধরেছেন। 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থে ভারতবর্ষের ইতিহাস ও সমাজের চিত্র স্বামীজী মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করেছেন। গ্রন্থটি সাধু ভাষায় লেখা। আলোচ্য গ্রন্থে শূদ্রজাগরণের প্রসঙ্গ যেমন স্থান পেয়েছে, তেমনি উঠে এসেছে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংঘর্ষ' থেকে শুরু করে 'স্বদেশমন্ত্র' পর্যন্ত। ভারতবর্ষের জাগরণের ক্ষেত্রে এই 'স্বদেশমন্ত্রে'র ভূমিকা অপরিসীম। 'উদ্বোধন' পত্রিকার প্রয়োজনেই স্বামীজী 'পরিব্রাজক' গ্রন্থটি লেখেন। পত্রিকায় প্রকাশকালে গ্রন্থটি 'বিলাতযাত্রীর পত্র' নামে প্রকাশিত হয়। আলোচ্য গ্রন্থটি বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যের ইতিহাসে এক অভিনব সংযোজন। এই গ্রন্থের মধ্যে আমরা দেখতে পাই স্বামীজীর অন্তর্দৃষ্টি কতটা স্বচ্ছ ও সূক্ষ্ম ছিল। যাত্রাপথের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা তাঁর লেখায় উঠে এসেছে। স্বামীজীর বিভিন্ন দেশের ইতিহাস, ভূগোল, ধর্ম, নৃতত্ত্ব, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্পকলা প্রভৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান কতটা গভীর ছিল তা আমরা লক্ষ্য করি এই গ্রন্থে। 'ভাববার কথা' গ্রন্থটি স্বামীজী 'হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ', 'রামকৃষ্ণ ও তাঁহার উক্তি', 'ঈশা-অনুসরণ', 'বর্তমান সমস্যা', 'বাঙ্গালা ভাষা', 'শিবের ভূত' প্রভৃতি রচনার সংকলন। 'বর্তমান সমস্যা' প্রবন্ধটি

'উদ্বোধন' পত্রিকার 'প্রস্তাবনা' হিসাবে প্রকাশিত হয়। আলোচ্য প্রবন্ধে স্বামীজী 'উদ্বোধন' পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন। স্বামীজী 'বাঙ্গালা ভাষা' রচনায় চলিতভাষা তথা কলকাতার কথ্যভাষাকে সাহিত্যের ভাব প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম হিসাবে ব্যবহারের সপক্ষে জোরালো সওয়াল করেছেন। গদ্য রচনাগুলির মধ্য দিয়ে সাহিত্যের আসরে বিবেকানন্দ অনন্য স্থান অধিকার করেছেন। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ ব্যক্তিগণ চলিত ভাষার প্রয়োগকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন।

পত্রসাহিত্যের মধ্য দিয়ে বিবেকানন্দের অন্তর্জীবনের পরিচয় আমরা পাই। বাংলা পত্রসাহিত্যের ধারায় মধুসূদনের পরবর্তীকালে বিবেকানন্দ উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছেন। পত্রাবলীতে স্বামীজী সাধু ও চলিত উভয় ভাষাই ব্যবহার করেছেন। স্বামীজী বাংলা সংস্কৃত, ফরাসী ও ইংরেজি ভাষায় পত্র রচনা করেছেন। তাঁর বাংলা লেখা ১৫৩টি চিঠি পাঠ করে বিবেকানন্দের অন্য এক রূপ আমরা অবলোকন করতে পারি। গুরুভ্রাতাদের লেখা পত্রগুলিতে তিনি চলার পথ অনেকাংশেই ঠিক করে দিয়েছেন এবং একটা সময়ের পর নিজে সমস্ত দায়িত্ব থেকে সরে এসেছেন। সংগঠন শক্তি বাড়ানোর কৌশল, মঠ স্থাপন, আজ্ঞাবহতা, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নির্দেশাবলী প্রভৃতি বিষয় তাঁর পত্রে স্থান পেয়েছে। টাকা নয়, মানুষকেই তিনি অধিক গুরুত্ব দিতে বলেছেন। অনাথ শিশুদের আশ্রয় দিয়ে তিনি সেবাকার্য চালিয়ে যেতে বলেছেন। এককথায় বলতে পারি পত্রাবলীর মধ্য দিয়ে আমরা ভবিষ্যৎদ্রষ্টা পথপ্রদর্শক বিবেকানন্দকে পাই। আমাদের জীবনের অনেক সমস্যা সমাধানের সঞ্জীবনী যেন পত্রাবলী।

স্বামী বিবেকানন্দের আর এক পরিচয় আমরা পাই কবি হিসাবে। তাঁর কবিতার সংখ্যা কম হলেও সেগুলির ভাব-ভাষা উৎকর্ষতার পরিচয়বাহী। বাংলা ও অনূদিত কবিতাগুলির মধ্যে আমরা বিবেকানন্দের কাব্যসুষমার পরিচয় পাই। প্রত্যেকটি কবিতাই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। 'সখার প্রতি' কবিতার শেষ চারটি লাইন আমাদের প্রত্যেকের মুখে মুখে ফেরে। তাঁর কথায়—

"ব্রহ্ম হ'তে কীট-পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়,
মন প্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে, এ সবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"[১৪]

স্বামীজী অনুবাদ ও সঙ্গীতের ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। বাংলা সাহিত্যে বিবেকানন্দের প্রভাব ক্রমবর্ধমান। তাঁর জীবন ও কর্মের পর্যালোচনা সমকালে যেমন হয়েছে তেমনি পরবর্তীকালে, এমনকি এখনও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। পূজনীয় সন্ন্যাসী মহারাজ ও প্রজ্ঞাবান মনীষীদের রচনায় বিবেকানন্দের কথা ও ভাবাদর্শকে নিয়ে গোটা বিশ্বে লেখালেখি চলছে। বিদেশের রোমাঁ রোলাঁ, মেরি লুইজ বার্ক থেকে শুরু করে এদেশের শঙ্করীপ্রসাদ বসু, শংকর, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়সহ আরও অনেকেই স্বামীজীকে নিয়ে লিখেছেন। আলোচ্য গবেষণাকর্মের মাধ্যমে আমার স্বামীজীর প্রতি ভক্তিপূর্ণ শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন রইল।

উল্লেখপঞ্জী

১। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, প্রকাশক : স্বামী বিশ্বনাথানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, চতুর্থ সংস্করণ : চৈত্র ১৩৮৩, ২৫তম পুনর্মুদ্রণ মাঘ ১৪২০, পৃ. ২০০।

২। জন্মসার্ধশতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি স্বামী বিবেকানন্দ, সম্পাদনা : স্বামী চৈতন্যানন্দ, প্রকাশক : স্বামী বিশ্বনাথানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০০০৩, প্রথম পুনর্মুদ্রণ ভাদ্র ১৪২২, পৃ. ৩৫৮।

৩। স্মৃতির আলোয় স্বামীজী, সম্পাদক : স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, প্রকাশক : স্বামী মুমুক্ষানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০০০৩, ১৬তম পুনর্মুদ্রণ মাঘ ১৪১৯, পৃ. ২৩৮।

৪। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, দশম খণ্ড, প্রকাশক : স্বামী বিশ্বনাথানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ২২তম পুনর্মুদ্রণ পৌষ ১৪২০, পৃ. ১০৬।

৫। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, প্রকাশক : স্বামী বিশ্বনাথানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ২৪তম পুনর্মুদ্রণ পৌষ ১৪২০, পৃ. ২৭০।

৬। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, প্রকাশক : স্বামী বিশ্বনাথানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ২৪তম পুনর্মুদ্রণ পৌষ ১৪২০, পৃ. ২৭৪।

৭। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, প্রকাশক : স্বামী বিশ্বনাথানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ২৪তম পুনর্মুদ্রণ পৌষ ১৪২০, পৃ. ৩১১।

৮। বিবেকানন্দ-ভাবনা, স্বামী স্বাহানন্দ [স্বামী স্বাহানন্দ কৃত 'service and spirituality' ইংরাজী গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ] অনুবাদক : শ্রীঅসিতচন্দ্র চক্রবর্তী, প্রকাশক : স্বামী মুমুক্ষানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা-৭০০০০৩, প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০০৩, প্রথম পুনর্মুদ্রণ আশ্বিন ১৪১৪, পৃ. ৫।

৯। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, দশম খণ্ড, প্রকাশক : স্বামী বিশ্বনাথানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ২২তম পুনর্মুদ্রণ পৌষ ১৪২০, পৃ. ১০৬।

১০। ভারতে বিবেকানন্দ, প্রকাশক : স্বামী মুমুক্ষানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০০০৩, ৩৯তম পুনর্মুদ্রণ কার্ত্তিক ১৪১৯, পৃ. ২০।

১১। তদেব, পৃ. ৪৬।

১২। তদেব, পৃ. ৯০।

১৩। তদেব, পৃ. ১৭২।

১৪। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, প্রকাশক : স্বামী বিশ্বনাথানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, চতুর্থ সংস্করণ : চৈত্র ১৩৮৩, ২৫তম পুনর্মুদ্রণ মাঘ ১৪২০, পৃ. ২১০।